পরিক্রমা

ভক্তবীর

এযুগে শ্রীরামকৃষ্ণের সত্ত্বগুণের লীলা। সে-লীলায় দানবদলন নেই, রাজ্যসম্পদের কথা নেই, নেই পাণ্ডিত্যের, বিদ্যার লৌকিক বৈভব। জন্ম এতই নীরবে নিভৃতে অজ পল্লিগ্রামে যে, তা নিয়ে আনন্দোৎসবও যাপন করেনি পল্লিবাসী। শুধুমাত্র দরিদ্র ক্ষুদিরামের গৃহে মঙ্গলশঙ্খের ঘোষণাধ্বনি। দুখিনী ব্রাহ্মণীর কোলে কে যে এলেন তার বার্তা পেলেন না পল্লিবাসী। জন্মের রহস্য শুধুমাত্র মাতাপিতাই জানলেন। তাঁদের আরাধ্য এসেছেন নিজে সেধে। গয়াধামে যে-পুরুষোত্তমকে ক্ষুদিরাম দর্শন করেন তিনি যেন দীনহীন ব্রাহ্মণ ক্ষুদিরামের গৃহে আসবেন বলে অপেক্ষমাণ। তাঁর ইচ্ছা অমোঘ—বাধা দিতে পারেননি সেই নিষ্কিঞ্চন ব্রাহ্মণ। ক্রমে সেই শিশু ভগবান হয়ে উঠলেন গ্রামের সকলের আদরের ধন, মাধুর্যের আকর। তাঁর কৃপামূর্তি দেখে ভক্ত লিখছেন,

''তাপিতে কি দিতে দেখা গোপনে এসেছ একা
নয়নে করুণামাখা হাস কাঁদ কার তরে।''

তাঁর ভক্তের অধিকাংশই ছাত্র, মাস্টারমশাই ও সংসারের তাপিত মানুষ। কৌমারবিগ্রহ যাঁরা তাঁদের গায়ে ধরার মলিন ধূলা লাগেনি। যাঁরা সংসারে রয়েছেন তাঁদের জীবন সংসারের আগুনে তপ্ত, যন্ত্রণায় দগ্ধ। কালির ঘরের মানুষ তাঁরা। অন্তরে শুভ্রতাকে রক্ষা করতে পারেননি। তাঁদের মাথায় কালির মুকুট। সমাজ তাঁদের ব্যথা, বেদনা, যন্ত্রণাকে উপেক্ষা করেছে। বলতে গেলে যারা পদস্খলিত পতিত জীবদের দলে, শ্রীরামকৃষ্ণের গিরিশের নাম তাদেরই তালিকার মাথায়।

গিরিশবাবুকে দেখেই তিনি চিনেছিলেন যে এবার তাঁরই উদ্ধার তাঁর লীলার অভিনব ঘটনা। এ যে তাঁর দৃষ্ট ভৈরবমূর্তি! ভৈরবের ভীষণতার সঙ্গে মিলেছিল পরমভক্তের আর্তি। তাই তিনি 'ভক্তভৈরব'।

শ্রীরামকৃষ্ণের উচ্চকোটির পার্ষদদের সঙ্গে গিরিশচন্দ্র ঘোষের মিলন এবারের লীলায় নতুন মাত্রার সংযোজন। যাঁর নামে, যাঁর গমনাগমনে বাগবাজারের গৃহস্থঘরের দরজা সশব্দে বন্ধ হত, সেই গিরিশ ঘোষের নাম ছিল 'নোটো গিরিশ'—মাতাল অর্থাৎ পানাসক্ত, মত্ত গিরিশ ঘোষ। অথচ দুর্দান্ত ভৈরবের জীবন যে কী ভীষণ দুঃখ-দুর্দশা ও সংঘাতে জর্জরিত ছিল তার চিত্র পরবর্তী কালে জীবনীকারেরা তুলে ধরেছেন। সংসারে তিনি যেন শিবের মতো হলাহল পান করেও হার মানেননি। সে-যুদ্ধ শুধু বাইরের কুসংস্কার ও ভণ্ডামিতে ভরা স্বার্থপর সংসারের সঙ্গে নয়—সে-সংগ্রাম তাঁর নিজের অন্তরাত্মার সঙ্গে যা পদে পদে তাঁর পথ চলা ব্যাহত করেছে। সে-পথে চলতে চলতেই তিনি বিশ্বাসের দুর্গ গড়ে তুলেছেন। সে-দুর্গনির্মাণ অপরাজেয় হয়েছিল শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপা ও আশীর্বাদে। কঠিন সংগ্রামে তিনি মান-অপমান, কুযশ-সুযশ, পরিচিত ও আপন প্রিয় পরিজনের মৃত্যুর মিছিল—সবই উপেক্ষা করে পর্বতের মতো অবিচল। কখনও দুঃখের ঝঞ্ঝাবাত বর্ষিত হয়েছে—সেখানেও শ্রীগুরুবাক্যে অটল বিশ্বাস স্থাপন, জগতের সব পরামর্শ উপেক্ষা করে। তাঁর বিশাল কলেবরে ও মুখে বিদেশিরাও দেখেছেন এক বলিষ্ঠ সুপুরুষকে যিনি ''জীবনের শেষপ্রান্তে পৌঁছেছেন তবু পৌরুষ, শক্তি, মাধুর্য, ধৈর্য ও আধ্যাত্মিকতায় পূর্ণ।''

শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবান্দোলনে গিরিশচন্দ্র শত শত মনে বিশ্বাসের তরঙ্গ তুলেছেন। তাঁর প্রচণ্ড ব্যক্তিত্ব, 'পাঁচ সিকে পাঁচ আনা ভক্তি'—তাঁর রচিত নাটকের মাধ্যমে উদ্বেলিত করেছে জনমানস।

সেদিনকার সমাজের ক্রূর চিত্র তাঁকে ক্ষুব্ধ আহত করেছিল। বেপরোয়া শক্তিমান পুরুষ গিরিশচন্দ্র সমাজের মানুষের অন্তর তন্ন তন্ন করে খুঁজে তাদের কুসংস্কারাচ্ছন্ন মনে মানবতার বলি দেখে ব্যথিত। মানুষের অবমাননায় তাঁর বিদ্রোহী সত্তা আত্মপ্রকাশ করেছে বিচিত্র নাটক ও রচনাসম্ভারে। এসবের মধ্যেও নাট্যাচার্য জনমনের সামনে তুলে ধরেছেন জাতপাত লোপকারী শ্রীচৈতন্যের জীবনকথা। তখনও জানেন না দক্ষিণেশ্বরের কোন দেবতার শক্তির স্ফুরণে তিনি এমন সক্রিয়। বিনা আমন্ত্রণেই গিরিশের নাটক 'চৈতন্যলীলা' দেখতে এলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। নাটকের মধ্যেই শুরু হল নতুন নাটক—ঠাকুরের সঙ্গে ভক্ত গিরিশের বিচিত্র লীলা। গিরিশের নাট্যপ্রতিভা তখন তুঙ্গে। কলকাতায় এক ডাকে মানুষ নতুন করে চিনেছে গিরিশ ঘোষকে। সেইসময় শ্রীরামকৃষ্ণের থিয়েটারে উপস্থিতি ও আশীর্বাদ যেন সমাজে সকল নাট্যশিল্পীর ঐতিহাসিক স্বীকৃতি বা ছাড়পত্র। বহু পরে গিরিশের সেই পরমপদে প্রণতি—''সকল মঙ্গলালয়, পূর্ণ বিরাজিত প্রেমের আধার।/ নির্বিকার, হর্ষ-শোক-বাসনাবর্জিত, জ্ঞানদীপ্ত মূর্তি মহিমার।''

বলরাম মন্দিরে নাট্যাচার্য গিরিশের প্রশ্ন—''গুরু কি?'' তিনি বললেন, ''গুরু কি জান? যেমন কুটনী। তোমার গুরু হয়ে গেছে।'' তখন গিরিশ সে-উত্তরের গভীরতায় প্রবেশ না করলেও কোথায় যেন আশ্রয়ের সন্ধান পেলেন। সকল ভক্ত বা আগন্তুককে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রণামরত নম্রমূর্তিই বোধহয় বিদ্রোহী গিরিশচিত্তে আলোড়ন তুলেছিল। তাই বলেছিলেন, ''এবার প্রণামঅস্ত্রে জগৎ-জয়।''

গিরিশের পড়াশোনা ছিল অগাধ। সমাজের উচ্চ থেকে নীচ—উভয় জীবনেরই অলিগলি ও রাজপথ দিয়ে তিনি হেঁটেছেন। কলকাতার বাবু কালচার তাঁর সত্তাকে বিদীর্ণ করেছে। খুঁজেছেন মহৎ মানুষ, উচ্চ আদর্শ, আর হারানো আর্য সংস্কৃতির মূল সুরটি।

সেই কল্লোলিত সত্তা মিলল রামকৃষ্ণসাগরে। ধীরে ধীরে তাঁর অন্তরাত্মাই জানিয়ে দিল—এ চিরকালের সম্বন্ধ। তিনি এযুগের অবতারের পার্ষদ। ক্লিন্ন পাপপথে হেঁটে তাঁকে এবার আসতে হয়েছে লীলা পোষ্টাইয়ের জন্য। এই অন্য থাকের ভক্তকে শ্রীরামকৃষ্ণ নিজের অন্তরঙ্গ পার্ষদদের মতোই পরম ভালবাসায় আকর্ষণ করেছেন। মায়ের যত্নে খাইয়েছেন, ঔদ্ধত্য সহ্য করেছেন স্নেহময় পিতার মতো। লৌহকঠিন উদ্ধত সত্তাকে স্বর্ণমূর্তি করে বলেছেন, ''তোকে দেখে লোকে অবাক হবে।''

গিরিশচন্দ্রের অটল ও অতল বিশ্বাস ভক্তসমাজে জোয়ার এনেছিল। শুধু শ্রীরামকৃষ্ণ নন, তাঁর পার্ষদগণও ক্রমে তাঁর কাছের মানুষ হয়েছিলেন। বিশেষ করে স্বামীজী এই ভক্তভৈরবকে সমমর্যাদা ও মান দিয়ে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। নাট্যাচার্য গিরিশ মঞ্চদেবতার মন্দির রচনা করেছিলেন মঞ্চপটে এবং নিজের হৃদয়ে। তাঁর নাটক ভক্তিপ্রবাহে ভাসিয়েছিল মানুষকে। মঞ্চের অতিনিন্দিত ও ঘৃণিত পাত্রপাত্রীরা খুঁজে পেয়েছিলেন আত্মমর্যাদা ও হারানো ব্যক্তিত্ব। পুরাণপুরুষ জেগে উঠেছিলেন নতুন আকার নিয়ে। নাটক হয়েছিল জনশিক্ষার শক্তিশালী মাধ্যম। শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবধারায় অবগাহন করে গিরিশচন্দ্র বাজিয়েছিলেন মানবতার বিজয়শঙ্খ। শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের নতুন ভাবাদর্শের আলোকে মানুষের মনে চেতনা জাগাতে সহায়তা করেছিলেন শক্তিমান নাট্যকার। তাঁর জন্মের একশো পঁচাত্তর বছর পর আজ মানুষ ভাবছেন— মানুষই কি দেবতার মহিমায় সমুজ্জ্বল হয় না? কালের কালো পর্দার নেপথ্য থেকে কি অনিঃশেষ মহিমার জ্যোতি উদ্গত হয় না? প্রণাম জানাই সেই নির্ভয়প্রাণ বিশ্বাসমূর্তিকে। প্রণাম। প্রণাম।